Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.09-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিজন ভট্টাচার্যের 'জননেতা': পাঠ ও পর্যালোচনা

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত

Absract:
One act play 'Jananeta' was written by playwright Bijan Bhattacharya who set the background of the Bengal famine for his drama of 1943. The character of public leader in the drama 'Jananeta' is equally relevant today even after seven decades of independent India. The public leader Narendranath's character has been portrayed in contrast to the real public leader. The character has followed the dramatist's intention. Narendranath's follower Laxmikanta, Trilochan, Sahayram Jabbur, Sadu khan's taste of Black market has ruined the life of ordinary farmers and has also made them helpless. Is this helplessness not visible in the 21st century? And public leader Narendranath is not a villain in the true sense? All these queries will be answered in the discussion article.

Key words: public leader, villain, famine, helplessness, 21st century.

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘের উন্মেষপর্বে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অবদান নাটকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে। পরবর্তী পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে নাট্য-পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবর্তনলগ্নে তাঁর শিল্পীসুলভ স্বাতন্ত্র্য ও বস্তুনিষ্ঠা তাঁকে কালোত্তীর্ণ প্রতিভার উজ্জ্বল শিরোপা দান করেছে। আমৃত্যু সাম্যবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘের অন্যতম পুরোধা নাট্যকার হয়ে কয়েক বছর পর ব্যক্তিসত্তাকে সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গণনাট্য সংঘ থেকে সরে গেলেও তিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে সদা জাগ্রত রেখেছিলেন 'গণ'-এর মনের কথাকে প্রতিফলিত করতে। তাঁর 'আগুন' 'জবানবন্দী' 'নবান্ন', জীয়নকন্যা', 'গোত্রান্তর', 'মরাচাঁদ' 'ছায়াপথ', 'গর্ভবতী জননী', 'দেবীগর্জন', 'আজ বসন্ত', 'চলো সাগরে', 'হাঁসখালির হাঁস' প্রভৃতি নাটক যেমন শোষিত শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী দলিত সম্প্রদায় সমূহের জীবনযাত্রার পরিচয় বহন করে তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাহিক জীবনের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সংঘাতের ইতিহাসসম্মত ধারাবাহিকতাকে আমাদের সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করার সুযোগ করে দেয়। সেই হিসেবে ইতিহাস ও যুগজিজ্ঞাসা বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিটি নাটকে একে অপরের পরিপূরক অঙ্গ হিসেবে অবস্থান করেছে। আমরা তাঁর লেখা একটি একাঙ্কিকা পাঠ করলে এই সত্যকে খুঁজে পাব যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে জনকল্যাণের দায়িত্ব নিতে যে জননেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের শঠতা ও ষড়যন্ত্র যেন স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে এবং এই জননেতারা ঠিক অপরিবর্তিতরূপে দেশের স্বাধীনতার সাত দশক পরও ক্রিয়াশীল রয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'জননেতা' নাটকটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (১৯৫১ খ্রি.) 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায়

মুদ্রিত হয়। পুস্তকাকারে নাটকটি প্রকাশ লাভ করেনি। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত 'বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ---১' গ্রন্থে নাটকটি স্থান পায়। তবে নাটকটি কোনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল কিনা সে তথ্য আমাদের কাছ নেই। 'জননেতা' ক্ষুদ্র কলেবরের, কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের কালজয়ী নাটকগুলোর মধ্যে একটি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি।

বিজন ভট্টাচার্যের 'জননেতা' নাটকের পটভূমি 'নবান্ন' নাটকের পটভূমির বিস্তৃততর রূপকে প্রকটিত করে। ১৯৪৩ সালের পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণার দলিল যদি 'নবান্ন' হয়, তাহলে 'জননেতা' হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের আর এক বীভৎস ছবি---যে ছবি দেশের স্বাধীনতাকে একটি প্রশ্ণ চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। প্রশ্ণটির উত্তর খুঁজে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিশ্লেষণটি হল---

> ''স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পদের লোভে জনদরদের ভান ও দুর্নীতিবান শক্তিমানদের স্বার্থরক্ষায় যুগপৎ নিয়োজিত 'জননেতাদের' জাতটিকে চিহ্নিত করতে 'জননেতা' নামে একাঙ্ক নাটকটি তার লক্ষ্যভেদ করে।'' (১)

'নবান্ন'-এর পটভূমিতে রয়েছে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, খাদ্য অন্বেষণে কাতারে কাতারে গ্রামের মানুষের শহরে ভিড় জমানো, নিষ্পাপ সরল মানুষদের জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারিদের দুষ্ট চক্রান্তের শিকার হওয়া, শহরে খিদের জ্বালায় তাদের ক্ষুধার্ত পশুর মত আতর্দান করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলেপড়া, গ্রামের সরল-সাধারণ কুললক্ষ্মীরা তাদের পেটের আগুন নেভানোর জন্য লম্পট অর্থগৃধ্নুদের কামনার শিকার হওয়া প্রভৃতি মর্মন্তুদ দৃশ্য। এই মানবতাহীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট একটু অন্যরূপে 'জননেতা' নাটকে ধরা পড়েছে, তবে এ দৃশ্য মানুষের গুপ্ত বিবেক বোধকে আহত ও কালিমালিপ্ত করে। এ নাটকে ১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরের প্রসারিত রূপ প্রকটিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের প্রভাব এ নাটকের মূল ভিত্তি রচনা করেছে। দুর্ভিক্ষকে হাতিয়ার করে শাসক ও শোষকশ্রেণি পরস্পর হাত ধরাধরি করে যে যার স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই দুই শাসন ও শোষণ যন্ত্রে পিষ্ট হয়েছে গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া অভাবগ্রস্ত কৃষকশ্রেণি। এরা সভ্যতার পিলসুজ, এদের আবহমান দুঃখ-কষ্টময় জীবনের কথা কবি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন তাঁর কবিতায়। কবির ভাষায়---

> ''বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা---সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
> সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
> একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'' (২)

প্রথাগত একাঙ্ক বা পঞ্চাঙ্ক নাটকের ঢঙে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'জননেতা' নাটকে 'অঙ্ক'র কথা উল্লেখ করেননি। এমন কী তিনি দৃশ্য বিভাজনের বিষয়টিও সুস্পষ্ট করেন নি। তবে নাটক পাঠে মনোনিবেশ করলে নাট্য নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠক-সাধারণ বুঝে নেবেন নাটকটিতে দুটো দৃশ্য রয়েছে। প্রথম দৃশ্যে জননেতার দপ্তরখানার কর্মচঞ্চলতার ছবি সহ তাঁর সাহায্যপ্রার্থীদের আসা-যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে জননেতার দপ্তরখানা পাল্টে গেছে, রয়েছে 'গণ'-দের সাথে জননেতার মুখোমুখি হওয়ার দৃশ্য এবং 'গণ' অর্থাৎ সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের সাথে জননেতার মুহুর্মুহু বাক্যুদ্ধের পটদৃশ্য ও তার অন্তিম হতাশাকর

পরিণতি। 'জননেতা' নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি জননেতা নরেন্দ্রনাথের দপ্তরখানায় প্রতিটি কর্মির ব্যস্ততা। টাইপ রাইটার মেশিনে ঝড়ের গতিতে টাইপ চলছে, দপ্তরখানার সামনের দিকের নিস্তরঙ্গ কক্ষে ইজি চেয়ারে চুপ করে বসে জননেতা কাগজ নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় গোটা দৃশ্যের অদ্ভুতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন। এই নরেন্দ্রনাথকে নাট্যকার চেনাচ্ছেন একেবারে প্রথমে নাট্যনির্দেশনার মাধ্যমে,

> ''জননেতা নরেন্দ্র নাথের দপ্তরখানা। ১৯০৫ থেকে'৫০ সাল---বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ পর্বের উত্তরকান্ড পর্যন্ত---দেশের রাজনৈতিক জীবনে নরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেও জননেতা তেমনি অক্লান্ত।'' (৩)

তাঁর মুখ ক্লিষ্ট হয়ে আছে, কারণ দেশের মানুষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু তাদের অন্নের কষ্ট দূর হয়নি। বংশগত গরিমায় তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত। বর্তমানে একটি অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জননেতা খুবই সাবধানী। কারণ---তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন 'রাজ্যি জয়' করে আরও বড় নেতা বা মন্ত্রী হওয়ার জন। সুযোগসন্ধানী এই মানুষটিকে নাট্যকার আঁকছেন খুবই সচেতনভাবে। তিনি ইজি চেয়ারে বসে---

> ''কাজগপত্তর দেখছেন আর মাদ্রাজি স্যান্ডেল পরা ডান-পাটা
> নাচাচ্ছেন। মাঝে মাঝে মুখ থেকে কাগজখানা সরিয়ে অন্তরাশ্রয়ী
> দৃষ্টিটা যখন চশমার কাচের ওপর নীচ দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করছেন,
> তখনই কেবল আঁচ পাওয়া যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের''। (৪)

জননেতা নরেন্দ্র নাথের দপ্তরখানায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী সরকারিকর্মচারি মি. দত্ত উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য, তিনি যে নামের তালিকা তৈরি করেছেন, সেই তালিকা অনুমোদন করে নেবেন নরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তাঁকে নরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছেন ডাকবাংলো থেকে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট মি. মুখার্জি তালিকাটিতে রয়েছে তাদের নাম যাদের কাছ থেকে এই দুর্ভিক্ষের সময় মফস্সলে কর্ডন প্রথা চালু করে কোটা পূরণের জন্য ধান সংগ্রহ করা হবে। মি. দত্ত নিষ্ঠাবান সরকারি কর্মচারি, তিনি পায়ে হেঁটে গ্রামের লোকজনদের কাছ থেকে খবর নিয়ে, সরেজমিন উপস্থিত থেকে তালিকা তৈরি করেছেন এবং বিবেচনায় রেখেছেন---কদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা খুবই জরুরি। সেই তালিকা দেখে নরেন্দ্রনাথ 'রেগে আগুন তেলে বেগুন' হয়ে গিয়ে ধমকের সুরে জানালেন---

> ''বোকার মতো কথা বলবেন না। কদ্দিন কাজ করছেন আপনি এই
> বিভাগে!.. আপনি কেন আগে আমার কাছে না এসে এখানে
> সেখানে ঘুরে ঘুরে নিজে গিয়ে লিস্ট তৈরি করেছেন! আপনি বাইরের
> লোক, এখানে কার ঘরে কী আছে কী নেই, আমার চাইতে সে বিষয়ে
> আপনি বেশি খবর রাখেন, না!''(৫)

কারণ, এই তালিকায় রয়েছে তাঁর কাছের মানুষ জোতদার, ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত, ত্রিলোচনা আর সহায়রামের নাম। তাঁর ধমকে মি. দত্ত পড়লেন ফাঁপরে, বাধ্য হয়ে বললেন---

> ''এই লিস্টই যে ফাইনাল লিস্ট---একথা তো আমি বলছি না। আপনার অনুমোদনের পরই সেই লিস্ট আমি করব।'' (৬)

এরপর নরেন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। জোতদারদের নাম বাদ দিয়ে বললন---

''বিদ্বেষবশত কেউ হয়তো আপনাকে বলেছে যে এদের সব বড়ো বড়ো স্টক আছে৷ খবরটা একেবারেই ভুল৷ আর এই লক্ষ্মীকান্ত, ত্রিলোচন আর সহায়রামের নামে যে স্টকের কথা আছে, এটা খানিকটা চাষিদেরই কো-অপারেটিভ স্টোর হিসেবে unction করে এখানে --- ধর্মগোলার মতো৷'' (৭)

জননেতা নরেন্দ্র নাথের চরিত্রে সুবিধাবাদী কৌশলী দিকটি প্রকটিত হয়েছে যখন একে একে তাঁর কাছে জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত, ত্রিলোচন, সহায়রাম, ভগবতীচরণ, জববর মিঞারা আসতে শুরু করে এবং তারা স্বার্থসিদ্ধির নানা ফন্দি-ফিকিরের কথা বলতে থাকে৷ জননেতা কৌশলী ভূমিকা নিয়ে তাদের দুর্বলতার দিকগুলি তাদেরই সামনে তুলে ধরছেন এবং সেগুলি চাপা দেবার জন্য বিভিন্ন রাস্তা দেখিয়ে তাঁর সুবিধা প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করছেন এই বলে যে, এবার তিনি যেন ইলেকশানে দাঁড়িয়ে জিততে পারেন, অন্যথায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠে যাবে৷ তবে তিনি খুবই সাবধানী, কারণ তিনি মনে করেন মোটেই যেন সাধারণ মানুষকে ভুল ভাবা না হয়৷ তাঁর মন্তব্য---

''... সেখানকার মানুষের মন তুমি জান না৷ কাজেই কারকিতি
বিস্তর করতে হবে৷ এখন এর জন্য চাই অর্থবল, লোকবল একটা
নির্বাচন জয় করা মানে তোমার যাকে বলে গিয়ে একটা রাজ্য জয় করা'' (৮)

নরেন্দ্রনাথ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন ভগবতীচরণ ও জববর মিঞার আগমনের পর৷ ভগবতীচরণ ব্যবসাদার, গাঁটরি গাঁটরি কাপড় কালোবাজারি করার জন্য মজুত করে রাখে৷ সে নিজে ইলেকশান কমিটির লোক হয়েও পাপের বৈতরণী পারাপারের জন্য সাহায্য নিয়েছে জননেতা নরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে৷ তার আইনি সমস্যা মেটাবেন নরেন্দ্রনাথ, তাই তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে সে৷ আর জববর মিঞা ধনেখালি অঞ্চলের গোলার মালিক৷ তার ধান যাতে সিজ না হয়--- সে ব্যাপারে সে নরেন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী৷ নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে ছেড়ে কথা বলেন নি, কারণ পেছনে রয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য৷ তিনি 'মহেশ দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের উৎস ধরে জববর মিঞাকে কাবু করেছেন৷ এবং বাধ্য করেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জববরকে তাঁর কাছে বংশবদ থাকতে৷ এমন সময় নেপথ্য থেকে হট্টগোলের আওয়াজ কানে আসে৷ 'জননেতার কাছে দু-তিনটি গ্রামের কৃষকরা আর্জি নিয়ে এসেছে তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য'---এদের প্রতি জননেতা একেবারে বিরক্ত৷ নিজেকে স্বচ্ছভাবমূর্তি সম্পন্ন জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর সাগ্রেদদের সামনে অনর্গল বক্তব্য দিয়ে যান৷ এমন সময় তাঁর টাইপিস্ট ভবানী এসে জানায়---কৃষকেরা মাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে তাঁকে সেখানে না পেয়ে আপনার কাছে এসেছে৷ কৃষকদের হট্টগোলের জেরে নরেন্দ্রনাথ ফ্যাসাদে পড়ে যান৷ এখানেই নাটকের প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে৷ প্রথম দৃশ্যের একমুখি গতি পরবর্তী দৃশ্যে climax-এর দিকে এগিয়ে চলে৷ কিন্তু climax একেবারে প্রত্যাশিত লক্ষ্যকে বিপরীতমুখি করে পাঠক ও দর্শককে হতাশার অন্ধকারে পতিত করে৷

দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় নাট্যকারের নাট্য নির্দেশনায় আমরা স্পষ্ট হই যে, নরেন্দ্রনাথের দপ্তর খানার আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম বের করে দিয়ে পেছনের দিকের অংশটি উঁচু প্লাটফর্মের মত তৈরি করা হয়েছে৷ এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবেন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা৷ আর দু-তিনটি গ্রামের লোক মিছিল করে এসে দাঁড়াবে প্লাটফর্মের ডানে ও বামে৷ এই লোকেরা অন্ধকারে সম্মিলিত স্বরে আবেদন নিবেদন করবে---''ধান নিওনা, কন্ট্রোল প্রথায় রেশন বরাদ্দ কর, আহার দাও, পরনের কাপড় বরাদ্দ কর৷'' এমন সময় আলোকসম্পাত

হলে জননেতা নরেন্দ্রনাথসহ ভগবতীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত জববর মিঞারা এসে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন৷ গ্রামের মানুষদের মাঝে সনাতন, পতিতপাবন, নরোত্তম, কৃপানাথরা হল জাতচাষি৷ এরা জননেতার কাছে এসেছে সমস্যার দ্রুত মীমাংসার জন্য৷ সমস্যাটি সনাতন বলেছে---

> ''কর্ডন করে যেভাবে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে, এটা কী বলব ---একেবারে যাচ্ছে---তাই৷ সরকার কি বলেছে যে খোরাকির ধান সীজ করবা!... অথচ জোদ্দার মহাজনের গোলায় হাত দেওয়া হচ্ছেনা৷... তামাম গেরামে অভাবি চাষির ঘরে আজ এক দানা চাল নেই৷... জোদ্দার মহাজনের গুদোমে যে হাজার হাজার মণ চাল, লক্ষ মণ ধান রয়েছে এবং যে ধান-চাল যথেষ্ঠ চোরাবাজারে চালান হচ্ছে, সেই ধান-চাল সীজ করা হচ্ছে না কেন!''[৯]

কালোবাজারিদের আড়াল করার জন্য নরেন্দ্রনাথ বলছেন যে তাদের লাইসেন্স আছে৷ মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যুত্তরে পতিতপাবন প্রশ্ন করেছে---এত নিরন্ন মানুষের জীবনের কোনো লাইসেন্স নেই! যারা হাজার হাজার মন চাল ব্ল্যাকমার্কেট করার সুবিধে পায় তাদের লাইসেন্স কোন্ সুবাদে দেওয়া হয় প্রসেেিডন্টবাবু একবার বলুন৷ জননেতা কৃষকদের কথার তিরের ফলায় বিদ্ধ হন, কিন্তু তিনি অযৌক্তিক কিছু কথা বলে তাদের বিভ্রান্ত করতে মোটেই পিছপা হচ্ছেন না৷ সাথে সাথে জানাচ্ছেন---সবই তিনি দেখছেন, সবই বুঝছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না৷ নরেন্দ্রনাথের উপায়হীনতার কথা শুনে কৃপানাথ পরামর্শ দিয়েছে, বলেছে উপায় না থাকলে তিনি যেন কর্ডন প্রথা বন্ধ করেন, সব লাইসেন্স-টাইসেন্স বন্ধ করেন এবং গুদোম খুলে চা কৃষকদের যেন দিয়ে দেন৷ সাথে সাথে সে এও চেয়েছে যে অনাবাদি জমি চাষের জন্য কৃষিঋণ বরাদ্দ করা হোক৷ এবং প্রতিবাদের সুরে বলেছে---

> ''...পেটে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই অথচ লক্ষ্মীকান্ত আর
> সাধুখাঁর গুদোমের হাজার হাজার মন চাল পাচার হয়ে
> যাচ্ছে চোরাবাজারে, এই ভগবতীচরণ আর কুন্ডুদের গদির গাঁট
> গাঁট কাপড় নৌকো করে লোপাট হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে
> আপনি দেখতে পারেন না!''[১০]

কিন্তু কৌশলী জননেতা নরেন্দ্রনাথ৷ তিনি ছাড়বার পাত্র নন, যেন তেন প্রকারেণ কৃষকদের মনোবল ভাঙবেন, বিভিন্ন দুরভিসন্ধি ঘটিয়ে তাদের যুক্তি-বুদ্ধিকে বানচাল করবেনই! তাই কখনো দরগার পীরসাহেবের প্রসঙ্গ টানছেন, কখনো মহাপুরুষদের কথা বলে তাদের মন ভিন্নমুখি করতে চাইছেন, আবার কখনো বলছেন, যদি গদিতে বসতেন তাহলে আজ এই দুর্গতি হতো না, এমন কী চোখের জল ফেলে দক্ষ অভিনেতার মত তিনি প্রতিবাদী কৃষকদের মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করতে চাইছেন৷ তিনি তাদের কাছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রার্থনা ভিক্ষা করতে ছাড়ছেন না৷ কিন্তু প্রতিবাদী কৃষকগণ এসমস্ত ধাঁধায় মুহূর্তের জন্য আচ্ছন হয়ে পড়লেও তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়নি৷ তাই পতিতপাবন বলেছে---

> ''... প্রেসিডেন্টবাবু, আপনি কি বলেন তাহলে আমরা সব ঘরে
> পড়ে মরব? কারো ঘরে আজ একদানা চাল নেই, পরনে বস্তর
> নেই অথচ চাল কাপড় যে বাজারে একেবারে নেই তাও তো না'' [১১]

জননেতা নরেন্দ্রনাথের মুখোশ সর্বসমক্ষে খুলে যায় যখন সখিচরণ জানায়, চাল আছে সাধুখাঁর ঘরে৷ নরেন্দ্রনাথ সব জেনেও অস্বীকার করেন এই বলে যে তাঁর কাছে প্রমাণ নেই৷ জনতার ভেতর থেকে ওফিলদ্দি বারংবার উচ্চারণ করেছে--- ''চাল নে লরি পালাল!!'' কথাটি নরেন্দ্রনাথকে বিধবস্ত করেছে, পীড়া দিয়েছে, এমন কী তিনি স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন---'' দে তো হারামজাদার কানটা ধরে বার করে৷

কে!'' এই উক্তিতে জননেতার অন্তরের কথা পাঠকেরা বুঝতে পারে৷ সাধু খাঁ মিথ্যা বলে যে, সে চাল মিলিটারিদের রিকুইজিশান চাল৷ জননেতা তখন যুক্তির সূত্র খুঁজে পেয়ে যান এবং ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের কানে মিথ্যাভাষণ দেবার চেষ্টা করেন৷ কিন্তু তারা এই ঘুমপাড়ানি গান শুনবে কেন, তাদের পেটে তো আগুন জ্বলছে! তাই পতিতপাবন একরোখা জবাব দেয়---''এই চাল কন্ট্রোল দরে আমাদের দিতি হবে তোমারে৷'' সাথে সাথে বলেছে নির্মম সত্যকথা, সেটি হল---

''তোমার 'সীজ রিকুইজিশন' সব বাজে কথা৷ মিথ্যে কথা৷ আসল
কথা হচ্ছে, পিসিডেন্টবাবু শোনবেন, আসল কথা কলাপোকার
হাটে পঞ্চাশটাকা দরে ঐ চাল তুমি বিক্রি করবে বলে নরি ভরতি করে পাচার করছিলে৷'' (১২)

প্রত্যুত্তরে নরেন্দ্রনাথ আইনের ভয় দেখিয়েছেন৷ এমন এক উত্তেজনার চূড়ান্ত মুহূর্তে সাধু খাঁ পালিয়ে গিয়ে তার চালভর্তি লরি দ্রুতবেগে নিয়ে চলে যায়৷ সঙ্গে সঙ্গে ওফিলদ্দি যখন বলে, চাল নিয়ে লরি চলে গেল তখন জননেতা মিথ্যার ফুলঝুরি বাক্য অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করতে থাকেন৷ তাঁর ছলা-কলা, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা বক্তব্য নাটকের অপ্রত্যাশিত পরিণতি নিয়ে আসে৷ তাঁর জননেতা সুলভ বক্তব্যের ফুলঝুরি 'নবান্ন' নাটকের যুধিষ্ঠির চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়৷ যুধিষ্ঠির 'নবান্ন' নাটকের ভুঁইফোড় নেতা, যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই৷ তাঁর বক্তব্যের অসাধারণত্বে মুহূর্তের জন্য সাধারণ মানুষ বশীভূত হয়, কিন্তু তিনি যে অন্তঃসার শূন্য সে বিষয়টি পাঠক বা দর্শকদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না৷ নরেন্দ্রনাথ ও যুধিষ্টির চরিত্র দুটি যে একসূত্রে গাঁথা এবং এই দুটি চরিত্র যে নাট্যকারের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে তা আমরা সহজে বুঝে নেব উভয়ের দুটি বক্তব্য উপস্থাপন করে---

''নরেন্দ্র নাথ৷৷ ... সুদিনের নাগাল যদি আমি পাই তখন এই দুর্নির্দনের
কথা আমরা নিঃসন্দেহে ভুলে যাব৷ এ রাতও কেটে যাবে, দিন
একদিন আসবেই এবং সেই বিশ্বাসেই আমি লড়াই করে যাব৷...'' (১৩)

''যুধিষ্ঠির ৷৷ ... আমি জানি, জয় পরিনামে হবে আমাদেরই, কিন্তু
সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ
রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে৷'' (১৪)

জননেতার বক্তব্যের শেষে তাঁর পাশে ভগবতীচরণ, ত্রিলোচন, লক্ষ্মীকান্ত, সহায়রাম ছাড়া আর কেউ নেই৷ তারাই ঘেমে যাওয়া নরেন্দ্রনাথকে বিশ্রামের জন্য ভেতরে নিয়ে যায়৷ 'জননেতা' নাটকের অন্তিম মুহূর্তকে আরও বেশি সুচারু ও মর্মস্পর্শী করে গড়ে তোলার জন্য নাট্যকার 'প্রযোজনা সম্পর্কে দু'চারটে কথা' বলেছেন৷

নাট্যকার জানিয়েছেন---

''যেমন লরিটার পালানোর ব্যাপারটায়---ধাবমান লরির শব্দ effect music হিসেবে ব্যবহার করতে হবে মাইক থাকলে, অন্যথায় লরিটা যে বমাল উধাও হয়ে যাচ্ছে সেটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে জননেতার বক্তৃণতার মাঝখানে৷... নরেন্দ্রনাথের বক্তব্য যদি অস্পষ্ট হয় তো তাতেও কোনও ক্ষতি হবে না৷'' (১৫)

নাটকের এই অন্তিম দৃশ্যে সংঘবদ্ধ জনতার মাঝ থেকে দারুণ ঘর্ষণে বমাল লরিটা উধাও হয়ে যাবার পেছনে রয়েছে পাঠকের দীর্ঘশ্বাস৷ কারণ, প্রত্যাশিত পরিণতিই পাঠক সাধারণ আশা করেছিলেন৷ তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন সাধু খাঁর লরি থেকে ক্ষুধার্ত মানুষেরা চাল ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু ফল হল উল্টো৷ লরিই

চলে গেল জনতার বুক চিরে, সাথে সাথে বিদীর্ণ হল পাঠকের হৃদয়৷ এই নির্মম বাস্তবতাকে চলমান লরির গর্জন এবং নরেন্দ্রনাথের অসংলগ্ন বক্তব্যের মাঝে এনে নাট্যকার বিভ্রম সৃষ্টি করে বিস্ময়রসে পরিণতি দান করিয়েছেন।

'জননেতা' নাটক পাঠের শেষে পাঠকের মনে জাগবে প্রশ্ন এবং চোখে ভাসবে সেকাল আর একালের নানা সাদৃশ্য৷ প্রশ্নটি হল, জননেতা নরেন্দ্রনাথ সত্যিকারে এই নাটকের নায়ক হতে পেরেছেন কিনা৷ এর সহজ উত্তরটি হল, জননেতা নায়ক নন, তিনি খলনায়ক বা ভিলেন হিসেবে এ নাটকে পুরোপুরি মানানসই৷ কারণ, তিনি নায়ক হলে তাঁর বুকে ব্যথা জমতো কৃষকদের দুর্দশা দেখে এবং কীভাবে সেই ব্যথা নিরশন করা যায় তার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন, তার বদলে তিনি চাষিদের উপকারের নামে তাদের সর্বনাশ করে চলেছেন জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য৷ তাঁর মুখ আর মুখোশ আলাদা বলেই তিনি শঠতার আশ্রয় নেন৷ তিনি ঘুণ পোকার মত সমাজের সমস্ত শুভকর প্রচেষ্টাকে কুরে কুরে নষ্ট করছেন আর সাধারণ মানুষের সরল স্বাভাবিক জীবনকে নষ্ট করে তাদের প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন৷ আসলে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাট্য-দর্শনের দিক থেকে একক নায়কের পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই এ নাটকের জননেতাকে খলচরিত্র হিসেবে এঁকেছেন৷ তাঁর কাছে আসল নায়ক হবে সাধারণ মানুষ, তাই এ নাটকে সনাতন, পতিতপাবন, নরোত্তম, কৃপানাথেরা যেভাবে পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে সহানুভূতি কুড়িয়ে সমষ্টি নায়কের আসন অলঙ্কৃত করেছে, সেখানে নরেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় বুঝে নিতে অসুবিধে হয়না৷ নরেন্দ্রনাথের মত জননেতা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অজস্র নেতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, যাদের মুখে রয়েছে জনদরদের অগ্নিগর্ভ ভাষণ আর বুকে লুকিয়ে আছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার অদম্য বাসনা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের সাথে 'জননেতা' নাটকের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কৃষকদের অবস্থানের ক্ষেত্রে দুটি নাটকে একটি বড় ফারাক আমরা লক্ষ করি৷ 'নবান্ন'-এ রয়েছে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী মানুষ সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, ফলে গ্রামের নিরন্ন কৃষককুল বাধ্য হয়েছে শহরে আসতে৷ তারা শহরের মানুষদের কাছে এক মুঠো ভাত ও সামান্য ফ্যানের বিনিময়ে বাঁচার আকুল প্রার্থনা করেছে৷ এদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে, আর যারা বেঁচেছে, তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে শান্তির নীড় রচনা করেছে নবান্ন উৎসব উদ্যাপনের জন্য৷ অন্যদিকে 'জননেতা' নাটকে কৃষকেরা হয়েছে অধিকার সচেতন, প্রয়োজনে তারা প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে৷ কিন্তু পরিণামে তারা হতাশার অন্ধকারে পতিত হয়েছে৷ গত শতকের পঞ্চাশের দশকের এই কৃষকদের অবস্থা কি আজকের অবস্থা থেকে আলাদা বলে মনে হয়? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর খোঁজা বড়ই কঠিন৷ কারণ, স্বাধীনতার সাত দশক অতিক্রম করে আমরা দেখেছি কৃষকেরা অর্থের অভাবে (ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে) আত্মহত্যা করেছে, অভাব-অনটনে নিজের সন্তানকে বিক্রি করেছে, কৃষক বিরোধী বিভিন্ন বিলের বিরুদ্ধে তারা দিনের পর দিন প্রতিবাদ ও মিছিল সংঘটিত করেছে, এমনকী এর জন্য মৃত্যুবরণও করেছে৷ এই সমস্ত ঘটনা কি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! এ এক বিস্ময় মাখা নির্মম বাস্তব কথা।

'জননেতা' নাটকে জববরের ধানের গোলা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে 'মাইনরিটি স্বার্থ' ও 'মাইনরিটি ভোট'-এর কথা৷ মাইনরিটি রাজনীতির খেলা ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে---একে মূল থেকে

উৎপাটন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়৷ আশ্চর্যের বিষয় মাইনরিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকভাবে অবস্থান করে জববর মিঞা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মাইনরিটিদের ঠকিয়ে 'মাইনরিটি স্বার্থ'-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে৷ এর থেকে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে!! একালেও ভোটতন্ত্রে মাইনরিটি শব্দটি খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ৷ বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'জননেতা' নাটকে মাইনরিটি প্রসঙ্গ এনে ভাবীকালকে কি সজাগ করতে চেয়েছিলেন? আমরা কি সজাগ হতে পেরেছি? এই সমস্ত উত্তর সময় দেবে, তবে এখন আমাদের এবিষয়ে ভাবা জরুরি৷

খুবই আশ্চর্যের বিষয়---আজ পর্যন্ত 'জননেতা' নাটক প্রসঙ্গে তেমন আলোচনা হয়নি। 'জননেতা' নাটকটিকে নিয়ে মঞ্চায়নের প্রচেষ্টা হয়েছে এমন খবর কানে আসে না। এমনকী বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা সূত্রে 'জননেতা' নাটকটি প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়। এই উদাসীনতা কি সময়ের, না আমাদের? দরদী পাঠকগণই উত্তর দেবেন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, নবারুণ এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ভূমিকা, বিজন ভট্টাচার্য, রচনা সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০৮ ভূমিকা,পৃ. দশ
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, এবার ফিরাও মোরে, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ২২৩
৩. ভট্টাচার্য, বিজন, জননেতা, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৫৭
৪. তদেব,
৫. তদেব, পৃ.২৫৮
৬. তদেব, প.২৫৯
৭. তদেব, পৃ, ২৫৯
৮. তদেব, পৃ.২৬২
৯. তদেব,পৃ.২৬৭
১০. তদেব,পৃ,২৬৮
১১. তদেব, পৃ,২৭০
১২. তদেব,পৃ.২৭৩
১৩. তদেব,পৃ.২৭৪
১৪. ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহণ-১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০৮
১৫. ভট্টাচার্য, বিজন, জননেতা, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.২৭৪

সহায়ক গ্রন্থ/পত্রপত্রিকা:

১) সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯৬
২) বিজন ভট্টচার্য রচনা সংগ্রহ-১, সম্পাদক নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় দে'জ পাবশিলিং ২০০৮
৩) প্রসঙ্গ বিজন, নাটক ও নাট্য সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্রিকা, কলকাতা, 2009